ইউনিট ৪: বৃটিশ ভারতে শিক্ষায় রাজনৈতিক প্রেক্ষিত: উনিশ ও বিশশতক

Political Perspectives of Education in British India: Ninetieth and Twentieth Century

ভূমিকা

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ভারতবাসীর শিক্ষা সম্পর্কে যাঁরা চিন্তা করেছেন তাঁদের মধ্যে প্রথম আধুনিক ভারত-পুরুষ রামমোহন রায় এর নাম শীর্ষে। তাঁর সমসাময়িক দ্বারকানাথ ঠাকুর, রাধাকান্ত দেব এবং রামকমল সেন প্রমূখ ব্যক্তির নামও এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। এ শতকের দ্বিতীয় পর্বে ভারতীয় মুসলিম সমাজে আধুনিক শিক্ষাদীক্ষার ব্যাপারে যেসব মুসলিম চিন্তাবিদ অগ্রণী ভূমিকা রেখেছেন তাঁদের মধ্যে স্যার সৈয়দ আহমদ খান, নবাব আব্দুল লতিফ এবং সৈয়দ আমীর আলী অন্যতম। এঁরা কোম্পানী অথবা বৃটিশ সরকারের চাকুরী নিয়ে (রামকমল সেন, দ্বারকানাথ ঠাকুর, স্যার সৈয়দ আহমদ, নবাব আব্দুল লতিফ, সৈয়দ আমীর আলী) অথবা নতুন শিল্প বাণিজ্যের উদ্যোগে (দ্বারকানাথ ঠাকুর) ইংরেজদের সংস্পর্শে এসেছিলেন। তাঁরা সকলেই বুঝতে পেরেছিলেন যে ইংরেজির মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ করা অতীব প্রয়োজন। এসঙ্গে আরো অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে সংস্কৃত বা ফার্সী নিয়ে আত্মতৃপ্ত থাকার কোন যৌক্তিকতা নেই। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি ভারতবাসীকে আগ্রহী ও সচেতন করে তোলার উদ্দেশ্যে এঁরা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বহু বিদ্বৎসভা বা Learned Society গড়ে তুলেছিলেন। উনিশ শতকে এসব বিদ্বৎসভার ব্যাপক কর্মকাণ্ডের ফলে ভারতীয় বিশেষতঃ উচচ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণি ইংরেজি তথা পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠে এবং একই সাথে রাজনৈতিকভাবে সচেতন হয়ে উঠে। প্রতিষ্ঠিত হয় রাজনৈতিক দল (ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ১৮৮৬, মুসলিম লীগ ১৯০৬)। রাজনৈতিক দলগুলির সংগ্রামের ফলে ধীরে ধীরে দেশবাসীর মধ্যে জাতি সচেতনতা দেখা দেয়। এই রাজনৈতিক জাতীয়তাবোধের বিকাশের পরবর্তী সোপান রূপে জাতীয় শিক্ষার ধারণার জন্ম। উনিশ শতকে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের সূচনা হলেও বাস্তবরূপ নেয় বিশ শতকে।

‘বৃটিশ ভারতে শিক্ষায় রাজনৈতিক প্রেক্ষিত’ শীর্ষক এ ইউনিটকে পর্যালোচনার সুবিধার জন্য নিচের ৩টি পাঠাংশে বিভক্ত করা হয়েছে।

পাঠ ৪.১: বিদ্বৎসভা: শিক্ষা ও রাজনীতি

পাঠ ৪.২: ঊনিশ শতকে জাতীয় শিক্ষার উদ্ভব

পাঠ ৪.৩: বিশ শতকে জাতীয় শিক্ষার বিকাশ

পাঠ ৪.১: বিদ্বৎসভা: শিক্ষা ও রাজনীতি

Association of Intellect: Education and Politics

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি−

- শিক্ষাক্ষেত্রে উনিশ শতকে প্রতিষ্ঠিত বিদ্বৎসভা সমূহের ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন।
- ভারতের যেসব প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্বৎজন শিক্ষা প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছিলেন তাদের অবদান ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে প্রাতঃসরণীয়দের ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

বিদ্বৎসভা

ভারতে শিক্ষার প্রয়াসের ফলে নগরে নগরে ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, রাজনীতি, বিজ্ঞান, বাণিজ্য বিষয়ক সভা-সমিতি প্রতিষ্ঠা হতে থাকে। যতদূর জানা যায়, স্যার উইলিয়াম জোনস কর্তৃক ১৭৮৪ সালে কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত 'এশিয়াটিক সোসাইটি' প্রথম শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। এতে প্রথমদিকে ভারতীয়দের স্থান ছিল না। যা হোক, উনিশ শতকের গোড়া থেকে ভারতীয় রাজনৈতিক সচেতন শিক্ষিত ও বিদ্বান ব্যক্তিবর্গ শিক্ষা বিষয়ক সভা-সমিতি প্রতিষ্ঠা শুরু করেন। এসব বিদ্বৎসভার বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল জ্ঞানবিদ্যার চর্চা ও আলোচনা, স্বাধীন মতামত ব্যক্তকরণ এবং বিদ্যার আদান-প্রদানসহ শিক্ষা আন্দোলন পরিচালনা।

একাডেমিক এসোসিয়েশন (১৮১৮)

ভারত তথা বাংলাদেশে মুক্ত চিন্তার পথিকৃৎ কলিকাতাস্থ হিন্দু কলেজের অধ্যাপক ডিরোজিও হিন্দু কলেজের উচ্চ শ্রেণির ছাত্রদের নিয়ে ১৮২৮ সালে কলিকাতায় একাডেমিক এসোসিয়েশন (Academic Association) নামে একটি বিতর্ক সভা গঠন করেন। এ সভার প্রধান লক্ষণীয় দিক ছিল যুক্তি। যুক্তি সিদ্ধ নয়, এমন কোন আলোচনার অবতারণা এ সভায় করা হত না। উক্ত সভার সভাপতি ছিলেন ডিরোজিও নিজে এবং সম্পাদক ছিলেন উমাচরণ বসু নামে একজন তরুণ। এ একাডেমিক এসোসিয়েশনে প্রধানত যে সব বিষয় নিয়ে বিতর্কসভা হত সেগুলি হল স্বাধীন চিন্তা, দেশপ্রেম, অদৃষ্টবাদ, পাপ-পূণ্যতত্ত্ব, ঈশ্বরের অস্তিত্ব, নাস্তিকতা, মূর্তিপূজার অসারতা এবং পুরোহিততন্ত্রের গ্লানি প্রভৃতি। সমকালীন সমাজসেবক, শিক্ষানুরাগী যেমন- রসিককৃষ্ণ মল্লিক, কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রাধানাথ শিকদার, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, হরচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ উক্ত সভার প্রধান বক্তারূপে উপস্থিত থাকতেন।

রামতনুলাহিড়ী, শিবনাথ দেব, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ শ্রোতারূপে উপস্থিত হতেন। ফলে ডিরোজিও একাডেমির আকর্ষণ তরুণদের মধ্যে বাড়তে থাকে। কলিকাতা শহরের শিক্ষিত তরুণরা ডিরোজিও ও তাঁর একাডেমির সংস্পর্শে আসার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠতেন। একাডেমির উদার পরিবেশে তাঁদের জ্ঞান, বিচার বুদ্ধি ও প্রতিভার উন্মেষ হতে থাকে। এই সভা অল্পদিনের মধ্যে শুধু ভারতীয় নয় ইউরোপীয়দেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। ডেভিড হেয়ার, লর্ড উইলিয়াম বেন্টিক-এর ব্যক্তিগত সেক্রেটারী কর্ণেল বেনসন্, বিশপ্ কলেজের অধ্যক্ষ ড. মিল্স প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বিতর্ক সভায় উপস্থিত থাকতেন এবং বক্তৃতা শুনে বিস্ময় ও আনন্দ প্রকাশ করতেন। মূলত একাডেমিক এসোসিয়েশন ছিল ইয়ং বেঙ্গলের ট্রেনিং স্কুল স্বরূপ। এ সভা ১৮৩৯ সাল পর্যন্ত

চলেছিল। আধুনিক যুগের ভারত তথা বাংলাদেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতির ইতিহাসে তাই একাডেমিক এসোসিয়েশনের গুরুত্ব অপরসীম।

সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা (১৮৩৮)

১৮৩৮ সালে ডিরোজিও-এর ভাবশিষ্য তারিণীচরণ বন্দোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, তারাচাঁদ চক্রবর্তী ও রাজকৃষ্ণ দে-এর উদ্যোগে সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা (Society for the Acquisition of General Knowledge) প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিদ্বৎসভার প্রধান লক্ষণীয় বিষয় ছিল সুস্থির বিদ্যা চর্চা ও গভীর জ্ঞান অর্জনের সংকল্প। দ্বিতীয়তঃ এ সভা কেবল পাশ্চাত্য বা সাধারণ বিদ্যাচর্চার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে স্থানীয় বিষয় নিয়ে পড়াশুনা ও আলোচনার পক্ষপাতী ছিল। সভার সভাপতি ছিলেন তারাচাঁদ চক্রবর্তী, সহ-সভাপতি রামগোপাল ঘোষ ও কালাচাঁদ শেঠ, দুইজন সম্পাদক রামতনু লাহিড়ী ও প্যারীচাঁদ মিত্র এবং পরিচালকমণ্ডলীতে ছিলেন কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায়, রসিকলাল সেন, মাধব মল্লিক প্রমুখ। সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ বিজ্ঞান, দর্শন সব বিষয় নিয়ে এ সভায় নিয়মিত আলোচনা হত। বাংলার নবীন বিদ্বৎ সমাজের প্রায় সকলেই এই সভার সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। এ সভায় যেসব প্রবন্ধ পড়া হয়েছিল তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল:

Nature and importance of Historical Studies (কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়), On Poetry (রাজ নারায়ন দত্ত), State of Hindoostan under the Hindoos (প্যারিচাঁদ মিত্র), Reform: Civil and Social (কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায়), On Native Female Education (প্যারীচাঁদ মিত্র), On the Physiology of Digestion (প্রসন্ন কুমার ঠাকুর), এতদ্দেশীয় লোকদের বাংলাভাষা উত্তমরূপে শিক্ষাদানকরণের আবশ্যকতা বিষয়ক প্রস্তাব (উদয় চন্দ্র আদ্য) এবং On the present state of the East India company's criminal Judicature and Police, under the Bengal Presidency (দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়) প্রভৃতি। দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে কোম্পানীর কর্মচারীদের ক্ষমতার অপব্যবহার, পুলিশের অসাধুতা ও অকর্মণ্যতা এবং ইংরেজদের এদেশে আসার অভিসন্ধি সম্বন্ধে জোড়ালো ভাষায় মন্তব্য করেন। জ্ঞানোপার্জিকা সভা এদেশে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারের প্রচেষ্টার সাথে সাথে বাঙালি শিক্ষিত সমাজের স্বাদেশিকতাবোধ জাগাতে অনন্য ভূমিকা রেখেছিল।

বেথুন সোসাইটি (১৮৫১)

জে. ই. ড্রিংকওয়াটার বেথুন (J. E. Drinkwater Bethune)-এর নামানুসারে কাউন্সিল অব এডুকেশন-এর সম্পাদক এফ.জে. মোয়াট (F. J. Mouat) সহ একদল শিক্ষিত বাঙালির উদ্যোগে ১৮৫১ সালের ১১ই ডিসেম্বর বেথুন সোসাইটি গঠিত হয়। সোসাইটির উদ্দেশ্য স্থির হয়েছিল, 'সাহিত্য ও বিজ্ঞান সম্পর্কিত নানা বিষয়ে আলোচনা।' সোসাইটির প্রাথমিক সদস্য ছিলেন ২৪ জন। তন্মধ্যে ১৯ জন ছিলেন বাঙালি, ৫ জন ছিলেন ইংরেজ। বাঙালির মধ্যে অন্যতম হলেন- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, কৈলাশ চন্দ্র বসু, রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ। এ সোসাইটির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল কয়েকজন বিশিষ্ট মুসলমান ব্যক্তি এ সোসাইটির সংস্পর্শে ছিলেন। তাঁদের মধ্যে মৌলভী আব্দুল লতিফ খাঁ অন্যতম। ইউরোপে যখন সমাজ বিজ্ঞান পঠন শৈশব অবস্থা তখন বেথুন সোসাইটিতে সমাজ বিজ্ঞান শাখা ছিল। অন্যান্য শাখাগুলি ছিল– শিক্ষা, সাহিত্য ও দর্শন, বিজ্ঞান, কলা, চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য এবং স্ত্রী জাতির উন্নতি। মূলতঃ বেথুন সোসাইটি ছিল জ্ঞানোপার্জিকা সভার সম্প্রসারিত সংস্করণ এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্থক অগ্রদূত। এখানে ইংরেজ ও বাঙালি একই মঞ্চে মিলিত হয়েছিলেন জ্ঞান চর্চার আন্তরিক অভিপ্রায় নিয়ে। এঁরা রাজনীতি ও ধর্ম এই দুইটি স্পর্শকাতর বিষয় ছাড়া জ্ঞানের সর্বক্ষেত্রেই বিচরণ করেছিলেন।

বিদ্যোৎসাহিনী সভা (১৮৫৩)

বেথুন সোসাইটির প্রতিপত্তির যুগে ১৮৫৩ সালে কালি প্রসন্ন সিংহের উদ্যোগে কলিকাতায় বিদ্যোৎসাহিনী সভা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্যারীচাঁদ মিত্র, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য প্রভৃতি সুধী বাঙালি বিদ্যোৎসাহিনী সভার সভ্য ছিলেন। এছাড়া বেথুন সোসাইটির প্রায় সব বাঙালি সভ্য বিদ্যোৎসাহিনী সভার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। উল্লেখ্য যে, বিশেষত তরুণ বিদ্যোৎসাহীরা এ সভায় যোগদানপূর্বক স্বচ্ছন্নে আলাপ আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে পারতেন, যা তাঁরা বেথুন সোসাইটিতে পারতেন না। তার প্রধান কারণ ছিল, বেথুন সোসাইটিতে ইংরেজদের সংখ্যাধিক্য না থাকলেও তাঁদের প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল বেশি। তাদের শৃঙ্খলা ও সংযত পরিবেশ বাঙালিদের কাছে খুব আকর্ষণের ছিল না। তাই বেথুন সোসাইটির খাঁটি বাঙালি সংস্করণ হল বিদ্যোৎসাহিনী সভা। সে যুগের পাশ্চাত্য শিক্ষায় ব্রতী বহু বিখ্যাত বাঙালি এ সভায় আমন্ত্রিত হয়ে ইংরেজি সাহিত্য সম্বন্ধে বক্তৃতা রাখতেন। বিদ্যোৎসাহিনী সভার মুখপত্র ছিল 'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা'। এ পত্রিকায় উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লেখকদের পুরস্কৃত করা হত। এসঙ্গে বিদ্যোৎসাহিনী সভা বাঙালির শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক জীবনে নববল সঞ্চারের উদ্দেশ্যে নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা করে এবং কলিকাতার বিভিন্ন স্থানে নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার অনুপ্রেরণা দান করে এক অভূতপূর্ব দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিল।

সমাজ সেবাও ছিল এ সভার একটি অন্যতম কার্যক্রম। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সমাজ সেবার আন্দোলনকে শুরু থেকেই সাহায্য সহযোগিতা করেছিল। এ সভা ঘোষণা করেছিল যে প্রথম যাঁরা বিধবা বিবাহ করবেন তাঁদের এক হাজার টাকা দেয়া হবে।

মহামেডান লিটারেরি সোসাইটি (১৮৬৩)

১৮৬৩ সালের ২ এপ্রিল বাঙালি মুসলমানের অন্যতম নেতা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট আব্দুল লতিফ খান কলিকাতায় মহামেডান লিটারেরী সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। এ সোসাইটির অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল সমকালীন পশ্চাদপদ মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে ইংরেজি ভাষা, ইউরোপীয় বিদ্যা ও বিজ্ঞানের প্রসারের স্বপক্ষে জনমত গঠন এবং শিক্ষিত হিন্দু-মুসলমান ও ইংরেজদের মধ্যে পারস্পরিক সদ্ভাব গড়ে তোলা। উল্লেখ যে এ সময়ে বাঙালি মুসলিমগণ মনে করতেন যে ইংরেজি শিখলে অথবা লেখাপড়ায় প্রতিবেশী হিন্দু সমাজের সংস্পর্শে আসলে ধর্মে আঘাত লাগবে। এজন্য মুসলিম সমাজ স্কুল বা পাঠশালার শিক্ষা থেকে নিজেদেরকে দুরে সরিয়ে রেখে ছিল। ইংরেজি শিক্ষার প্রতি মুসলিম সমাজের বিদ্বেষভাব দূর করতে পাশ্চ্যাত্য বিদ্যা ও বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহী করে তুলতে নবাব আবদুল লতিফের নেতৃত্বে মহামেডান লিটারেসি সোসাইটি গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর ভূমিকা রেখেছিল। সোসাইটির মাসিক সভার নিয়ম ছিল। এসব সভায় মুসলিম সমাজের শিক্ষা সমস্যা, সামাজিক ও ধর্মীয় বিষয়ের উপর প্রবন্ধ পঠিত হত। এছাড়া ইতিহাস, ভূগোল, কৃষি শিক্ষা, বাণিজ্য এবং সংবাদপত্রের উপরও প্রবন্ধ পড়া হত এবং আলোচনা হত। শুরু থেকে মহামেডান লিটারেরি সোসাইটি বাঙালি মুসলিম সমাজের শিক্ষা বিস্তার ও শিক্ষা সংস্কারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৮৬৯ সালে স্যার উইলিয়াম গ্রে কলিকাতা মাদ্রাসার পশ্চাৎমূখী শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করে একে কিভাবে পূনর্গঠিত করা যায় সে সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। আব্দুল লতিফ একমাত্র ভারতীয় সদস্য (অন্য দুইজন প্রেসিডেন্সী বিভাগের কমিশনার সি. এইচ. কাম্বেল এবং প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ জে সাটক্লিফ) সোসাইটির সাধারণ সভায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ কমিশনকে প্রদান করেন। সোসাইটির অধিকাংশ সুপারিশ কমিশন গ্রহণ করে। ১৮৮২ সালে হান্টার কমিশনের কাছেও সোসাইটি বক্তব্য পেশ করেছিল। মুসলমানদের স্বার্থক্ষুন্ন হবে এরূপ আশঙ্কার কথা জানিয়ে সোসাইটি জনশিক্ষা পরিষদের গৃহীত নতুন শিক্ষানীতির সমালোচনা করে। ধর্মীয় শিক্ষা ও দান কার্যের জন্য যেসব ওয়াকফ সম্পত্তি আছে সেগুলি যাতে দাতাদের অভিপ্রায় অনুযায়ী ধর্মীয় শিক্ষা ও সৎকার্যে ব্যয় হয় সে বিষয়ে সোসাইটি সরকারের কাছে জোরালোভাবে সুপারিশ জানিয়েছিল। উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে উৎসাহিত করার জন্য সোসাইটি কয়েকটি ছাত্রবৃত্তি ও পুরস্কার দানের ব্যবস্থা

করেছিল। ১৮৮৩ সালে সোসাইটি লর্ড রিপনকে দেয়া এক স্বারকপত্রে সৈয়দ আমীর আলীর নেতৃত্বে সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশনের মাদ্‌রাসা শিক্ষা বিরোধী প্রস্তাবের নিন্দা করে মাদ্রাসা শিক্ষা চালু রাখার পক্ষে সুপারিশ রাখে। মোট কথা সোসাইটির উদ্যোগের ফলে ক্রমবর্ধমানহারে বাঙালি মুসলিম সমাজ ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণের জন্য এগিয়ে আসে।

মাদ্‌রাসা লিটারেরি এন্ড ডিবেটিং ক্লাব (১৮৭৫)

মহামেডান লিটারেরি সোসাইটির আদর্শে ও অনুপ্রেরণায় ১৮৭৫ সালে কলিকাতা মাদ্‌রাসা লিটারেরি এন্ড ডিবেটিং ক্লাব' প্রতিষ্ঠিত হয়। মূলত এটি ছিল কলিকাতা মাদ্রাসার ছাত্রদের প্রতিষ্ঠান, সাহিত্য চর্চা ও জ্ঞানানুশীলন ছিল এর মুখ্য উদ্দেশ্য। ক্লাব বির্তক সভার আয়োজন করে সমাজ শিক্ষা সংস্কৃতি বিষয়ক সমস্যার উপর আলোচনা করত। ক্লাবটি 'দি মাদ্‌রাসা লিটারেরী বাজেট' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করত।

সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশন (১৮৭৭)

মহামেডান লিটারেরী সোসাইটির প্রতিষ্ঠার পনের বৎসর পর পাশ্চাত্য শিক্ষার অনুরাগী বিশিষ্ট মুসলিম শিক্ষাবিদ সৈয়দ আমীর আলী কলিকাতায় ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশন (১৮৭৭) প্রতিষ্ঠা করেন। শিক্ষার সঙ্গে মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা বিষয়টি তিনি গুরুত্বের সঙ্গে অনুধাবন করেছিলেন। এ সঙ্গে মুসলিম স্বার্থ সংরক্ষণ এবং তাঁদের সমস্যার প্রতি গভর্মেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যই সৈয়দ আমীর আলী এ এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এটি মূলতঃ বাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। তবে শিক্ষা ও সমাজ এর কর্মসূচির অন্তর্ভূক্ত ছিল। প্রতিষ্ঠাতা সৈয়দ আমীর আলী এসোসিয়েশনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেন, আইনগতভাবে নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় ভারতীয় মুসলমানদের কল্যাণের জন্য চেষ্টা করার উদ্দেশ্যে এ সমিতি গঠিত হয়েছে। এটা ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্যের নীতি অনুসরণ করবে। এ সমিতি মুসলমানদের অতীতের গৌরবময় ঐতিহ্য থেকে অনুপ্রেরণা গ্রহণ করবে এবং তাদের মধ্যে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রগতিশীল মতবাদ প্রচলন করতে চেষ্টা করবে। সৈয়দ আমীর আলী ছিলেন এসোসিয়েশনের কর্ম সচিব। তার আন্তরিক চেষ্টায় বাংলা, বিহার, যুক্তপ্রদেশ পাঞ্জাব, মাদ্রাজ ও বোম্বে প্রদেশে এসোসিয়েশনের ৫৩টি শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। এসোসিয়েশন মুসলমানদের রাজনৈতিক শিক্ষা ও ঐক্যের জন্য বক্তৃতা ও বার্ষিক সম্মেলনের আয়োজন করত। এ সাথে মুসলিম সাম্প্রদায়ের মধ্যে সুস্থ সাহিত্য সৃষ্টি এবং মাতৃভাষায় সাহিত্যের উন্নতির জন্য এসোসিয়েশন প্রয়াস চালায়। ১৮৮০ সাল থেকে পদক ও অন্যান্য পুরস্কার প্রদান করে এ ব্যাপারে উৎসাহিত করে। ১৮৮২ সালে হান্টার কমিশনের নিকট সৈয়দ আমীর আলী মাধ্যমিক স্তর থেকে উপরের দিকে ইংরেজি বিষয় আবশ্যিক করার প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু আব্দুল লতিফ এ প্রস্তাবের বিরোধীতা করেন। ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশন শিক্ষা মিশনের নিকট মুসলমানদের দাবী সম্বলিত একটি স্বারকলিপি পেশ করে। এতে হুগলী, ঢাকা, চট্রগ্রাম ও রাজশাহীর মাদ্‌রাসাগুলি তুলে দিয়ে ঐ খরচে কলিকাতায় শুধুমাত্র মুসলমানদের জন্য একটি ইংরেজি কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারের প্রতি দাবী জানায়। এসোসিয়েশনের এ প্রস্তাব সম্পর্কে মতামত দেয়ার জন্য সরকার আব্দুল লতিফকে অনুরোধ জানালে তিনি Paper on the present condition of Indian Mohamedans and the best means for its improvement শীর্ষক প্রবন্ধ লিখে তাঁর মতামত পেশ করেন। এতে তিনি মাদ্রাসাগুলি তুলে দেবার প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। তবে এসোসিয়েশনের দাবী পূরণ না করলেও সরকার ১৮৮৪ সালে কলিকাতা মাদ্‌রাসায় কলেজ মানের ইংরেজি শিক্ষার ব্যবস্থা নেয়। ১৮৮২ সালে এসোসিয়েশন ভাইসরয় লর্ড রিপনের নিকট দেয়া এক স্মারকপত্রে উল্লেখ করে যে দারিদ্রতার কারণে মুসলিমগণ ব্যয়বহুল ইংরেজি স্কুল কলেজ তাদের ছেলে মেয়েদের লেখা পড়া শেখানো সম্ভব হচেছ না। এজন্য মাদ্‌রাসাগুলিতে ইংরেজী শিক্ষা দেখার ব্যবস্থা করার এবং মুসলিম অঞ্চলে মুসলমান শিক্ষক ও ইনস্পেক্টর নিয়োগ করার দাবী জানায়। এছাড়া মহসিন ফান্ডের এবং অন্যান্য ওয়াকফ সম্পত্তির টাকা শুধুমাত্র মুসলিম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ছাত্রদের শিক্ষার জন্য ব্যয় করার দাবী উত্থাপন করেন।

মুসলিম স্বার্থ রক্ষার সাথে ভারতের বিভিন্ন বর্ণ ও ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে সৌহার্দমূলক সম্পর্ক গড়ে তোলা ছিল সেন্টাল ন্যাশনাল মহামেডানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ফলে অমুসলিমগণ অবাধে এ প্রতিষ্ঠানে সদস্যভূক্ত হতে পারতেন। তারা মুসলমানদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে ভোট দানের অধিকারী ছিলেন। এমন কি ১৮৮৩ সালে রাজা ইন্দ্র চন্দ্র সিং এসোসিয়েশনের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। এ ছাড়া রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, রায় বাহাদুর ক্রিশত দাম পাল ও মহারাজা যতীন্দ্র মোহন ঠাকুরসহ ৬ জন হিন্দু সদস্য কমিটির অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন।

ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের পরেও ভারতীয় মুসলিম সম্প্রদায় পুরাতন ইসলামী শিক্ষার দীক্ষার মধ্যে আবদ্ধ থাকার ফলে মুসলিম সমাজ পিছিয়ে পড়ে। মধ্যযুগীয় শিক্ষার পরিবর্তে মুসলিম সমাজকে ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী করতে মুসলিম সমাজের জাগরণের অগ্রদূত স্যার সৈয়দ আহমদ ১৮৭০ সালে বেনারসে ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষার উন্নতির সমিতি (Society for the Educational Progress of Indian Muslims) নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। সমিতির বিভিন্ন আলোচনা ও উপদেশ বিবেচনা করে এবং মুসলমানদের পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানে শিক্ষিত করে হিন্দুদের সমকক্ষ করে তুলবার উদ্দেশে স্যার সৈয়দ আহমদ আলিগড়ে এ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। উল্লেখ যে সৈয়দ আহমদের ইচ্ছা ছিল কেম্ব্রিজের মত একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা। কিন্তু তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার সম্মত না হওয়ায় একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হয়। ৮ জানুয়ারী ১৮৭৭ ভারতের ভাইসরয় লর্ড লিটন মোহামেডান এ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজের ভিত্তি স্থাপন করেন। এ কলেজ শেষ পর্যন্ত আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়। এই কলেজের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মুসলমান ছাত্রদের সম্পূর্ণরূপে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত করা এবং সেই সাথে ইসলামের নিয়মকানুন বাধ্যতামূলকভাবে পালন করতে শিক্ষা দেয়া। একদিকে পাশ্চাত্য জগতের আধুনিকতা, অন্যদিকে ইসলামীয় মধ্যযুগীয়তা ছাত্ররা সমানভাবে অনুসরণ করবে। এই ছিল কলেজের ব্যবস্থা। যা হোক পরবর্তীকালে এ কলেজকে কেন্দ্র করে ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে আধুনিক ভাবধারা, চিন্তা-চেতনা জাগ্রত হয়। তবে স্যার সৈয়দ আহমদ অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে একটি কলেজ দ্বারা সাত কোটি মুসলমানের উপকার করা যাবে না। এ ছাড়া সকলের পক্ষে আলীগড়ে এসে পড়াশুনা করা সম্ভব নয়। তাই কলেজের কর্মকান্ড সবিস্তারে ভারতের আনাচে কানাচে পৌঁছানোর উদ্দেশ্য নিয়ে ১৮৮৬ সালে 'মহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্স' নামে একটি সমিতি গঠন করেন। এ সমিতি ভারতের সর্বত্র সভা সমাবেশ করে আলীগড় আন্দোলনের ব্যাপক কর্মকান্ডের প্রচার চালায়। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে সহায়তা দান এবং বিকাশের পথের সমস্ত বাধা-বিপত্তি দূরীকরণ। শেষ পর্যন্ত এ সমিতি মুসলিম সমাজের বুদ্ধিবৃত্তির প্রধান সংগঠনে পরিণত হয়েছিল। সমকালীন মুসলিম বিদ্যৎজন যেমন নবাব মহসিন-উল-মূলক, ডাঃ নজির আহমদ, হালী ও শিবলীর ন্যায় বক্তা ও কবি এর বিভিন্ন সভায় যোগদান করেন এবং সামাজিক সংস্কার, আধুনিক শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তির প্রসারে সহায়তা করেন। উল্লেখ যে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার পূর্বে 'মহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্স' ভারতীয় মুসলমানদের রাজনৈতিক মুখপাত্র হিসাবেও কাজ করে।

উল্লিখিত বিদ্যৎসভা ছাড়াও উনিশ শতকে জ্ঞান-সন্দীপন সভা (১৮৩০), ডিবেটিং ক্লাব (১৮৩০), বিজ্ঞানদায়িনী সভা, সর্বতত্ত্বদীপিকা সভা (১৮৩২), জ্ঞানচন্দ্রোদয় সভা, টিচার্স সোসাইটি, বঙ্গভাবানুবাদক সভা, বঙ্গভাষা প্রবেশিকা সভা (১৮৩৬), সুহৃদ সমিতি (১৮৫৪), ফ্যামিলি লিটারারি ক্লাব (১৮৫৭), বঙ্গীয় সমাজ বিজ্ঞান সভা (১৮৬৭) প্রভৃতি স্বল্পকালীন স্থায়ী সভা-সমিতি গড়ে উঠেছিল। এসব সভা-সমিতি থেকে শিক্ষা ও সংস্কৃতি তথা দেশাত্ববোধ, জাতীয়তাবাদ, স্বাধীনতা স্পৃহা, যুক্তিবাদ, মানবতাবাদ প্রভৃতি আধুনিক ভাবধারা উৎসারিত হয়েছিল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.১

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. এশিয়াটিক সোসাইটি কত সালে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল?
ক. ১৭৬৪ খ. ১৭৭৪
গ. ১৭৮৪ ঘ. ১৭৯৪

২. একাডেমিক এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন?
ক. ডিরোজিও খ. উমাচরণ বসু
গ. প্যারীচাঁদ মিত্র ঘ. বাসতনু লাহেরী

৩. মহামেডান লিটারেরি সোসাইটি কত সালে প্রতিষ্ঠা করা হয়?
ক. ১৮২৩ খ. ১৮৬৩
গ. ১৮৫৩ ঘ. ১৮৮৩

৪. সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশন-এর প্রতিষ্ঠাতা কে?
ক. সৈয়দ আমীর আলী খ. আব্দুল লতিফ খান
গ. কেরামত আলী ঘ. সৈয়দ আহম্মদ

উত্তরমালা: ১. গ; ২. ক; ৩. খ; ৪. ক

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. কী উদ্দেশ্যে শিক্ষা বিষয়ক বিদ্বৎসভা গঠিত হয়েছিল?
২. একাডেমিক এসোসিয়েশনের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।
৩. সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভার উদোক্তা কারা?
৪. সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভায় গঠিত প্রবন্ধগুলো কী কী?
৫. শিক্ষাক্ষেত্রে বেথুন সোসাইটির ভূমিকা বর্ণনা করুন।
৬. বিদ্যোৎসাহিনী সভা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।
৭. মহামেডান লিটারেরি সোসাইটি কত সালে এবং কী উদ্দেশ্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল?
৮. মাদ্‌রাসা লিটারেসি এন্ড ডিবেটিং ক্লাব সম্পর্কে একটি টীকা লিখুন।
৯. সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশন কে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং এটি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য কী ছিল?
১০. আলীগড় আন্দোলন বলতে কী বুঝায়?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. ঊনিশ শতকে ভারতে শিক্ষা বিস্তারে প্রধান প্রধান বিদ্বৎসভার ভূমিকা বর্ণনা করুন।
২. ভারতে শিক্ষা বিস্তারে মহামেডান লিটারেসি সোসাইটি এবং সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশনের ভূমিকা পর্যালোচনা করুন।

পাঠ ৪.২: ঊনিশ শতকে জাতীয় শিক্ষার উদ্ভব
Origin of the National Education in Ninetieth Century

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ঊনিশ শতকে ভারতে জাতীয় শিক্ষার উদ্ভবের পটভূমি বর্ণনা করতে পারবেন।
- ঊনিশ শতকে ভারতে জাতীয় শিক্ষার প্রয়াসে বিভিন্ন সংগঠনের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

ঊনিশ শতক

ইংরেজ শাসিত ভারতের শিক্ষার ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপর্ণ ঘটনা হল জাতীয় শিক্ষার উন্মেষ। ইংরেজ শাসকগণ, বিশেষত লর্ড মেকলে দেশীয় শিক্ষার মান উন্নয়নের প্রস্তাবকে অসম্ভব ও অবাস্তব বলে মন্তব্য করেন। দেশে পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রচার ও প্রসারে রামমোহন, দ্বারকানাথ সহ তৎকালীন সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ উদ্যোগী হয়ে সরকারকে সহযোগীতা ও সমর্থন করেছিলেন। যুগের দাবীকে উপেক্ষা না করে এঁরা পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানকে গ্রহণ করতে আগ্রহী হয়েছিলেন এবং পাশ্চাত্য বিজ্ঞানকে আয়ত্ত করার প্রয়োজনে ইংরেজি শিক্ষা সম্পর্কে উৎসাহী ছিলেন। তবে জাতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ইংরেজি শিক্ষিত একটি দল গড়ে উঠুক- যাঁদের সঙ্গে সংখ্যাগরিষ্ট লোকের যোগ থাকবে না; এরূপ শিক্ষা ব্যবস্থার পক্ষপাতী তাঁরা ছিলেন না। কিন্তু ইংরেজ শাসকদের মনোভাব ছিল ভিন্ন। দেশ শাসনের প্রয়োজনে এমন একটি শিক্ষিত শ্রেণি সৃষ্টি করবে যাঁরা শুধু কোম্পানী কর্মচারীর অভাবই পূরণ করবে না- সাথে সাথে এঁরা হবে কোম্পানীর অন্ধ সমর্থক। উডের ডেডপ্যাচে (১৮৫৪) স্পষ্ট বলা হয়েছে, শিক্ষার মধ্যে দিয়ে যোগ্য নৈতিক বুদ্ধি সম্পন্ন বিশ্বাসী কর্মচারীর সৃষ্টি করা সরকারী শিক্ষানীতির প্রধান লক্ষ্য। ইংরেজ শাসকদের এরূপ শিক্ষানীতির প্রতিবাদ স্বরূপ জাতীয় শিক্ষার ধারণার জন্ম।

উনিশ শতকে জাতীয় শিক্ষার উদ্ভব

হান্টার কমিশনের (১৮৮২) সামনে অনেক শিক্ষিত ভারতবাসী নিজেদের বক্তব্য রাখতে গিয়ে ধর্মীয় শিক্ষার অভাব, জনশিক্ষার ধীর অগ্রগতি প্রভৃতি সম্বন্ধে অভিযোগ উত্থাপন করেছিলেন। এতে স্পষ্ট হয় যে ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থায় ভারতবাসী সন্তুষ্ট ছিলেন না এবং এ শিক্ষা ব্যবস্থা পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার সমালোচনার মনোভাব থেকে জন্ম নিয়েছিল শিক্ষার ক্ষেত্রে জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গী। সমালোচকগণ ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থায় যে সব পরিবর্তনের কথা বলেছিলেন সেগুলোর মধ্যে ভারতবাসীর হাতে শিক্ষা পরিচালনার ক্ষমতা দান, ধর্মীয় শিক্ষার আয়োজন, ভারতীয় সংস্কৃতির উপর বিশেষ পাঠ্যক্রমের প্রবর্তন, ভারতীয় প্রাচীন ভাষার চর্চা এবং আধুনিক ভারতীয় ভাষার প্রতি অধিকতর মনোযোগদান প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

হিন্দু মেলা (১৮৬৭)

ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ (১৮৫৭) তথা সিপাহী যুদ্ধের পর ভারতীয় শিক্ষিত নাগরিকদের মধ্যে জাতীয় সচেতনতা আস্তে আস্তে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। এ সচেতনতা বৃদ্ধির ভূমিকায় ১৮৬১ সালে রাজনারায়ন বসু

প্রতিষ্ঠিত 'জাতীয় গৌরব উন্নয়ন সমাজ' এবং তাঁর বন্ধু বান্ধব ও অনুরাগীদের নিয়ে হিন্দু মেলার (১৮৬৭) শুরু মাইল ফলক হিসাবে বিবেচনার দাবী রাখে। এই মেলাতে বহু দেশপ্রেমিক কবি– সাহিত্যিক, শিল্পী সমাগত হত এবং কালক্রমে এ বাৎসরিক অনুষ্ঠানটি জাতীয়তাবাদী মনোভাব জাগরণে একটি শক্তিশালী মাধ্যম হয়ে উঠে।

যুব শিক্ষা পরিষদ (১৮৯১)

ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে অসন্তোষ শুধুমাত্র সমালোচনা ও নিন্দাতে সীমাবদ্ধ রইল না। ধীরে ধীরে বিভিন্ন গঠনমূলক কাজের মাধ্যমে শিক্ষা সংস্কারের প্রচেষ্টা চলতে থাকে। বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভারতীয় উপাচার্য গুরুদাস বন্দোপাধ্যায়, সাহিত্যিক বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন যুবগণের উচ্চ শিক্ষা পরিষদ (Society for the higher training of young men)। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষার ত্রুটিগুলি বর্জন করে দেশের যুব সমাজের জন্য একটি উচ্চ শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠাই ছিল এ সোসাইটির উদ্দেশ্য।

ভাগবত চতুস্পাঠী (১৮৯৫)

জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের অন্যতম দিশারী সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮৬৫ - ১৯৪৮) স্যার রমেশ চন্দ্র মিত্র এর সহযোহিতায় ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার ভবানীপুরে 'ভাগবত চতুস্পাঠী' প্রতিষ্ঠা করেন। এই চতুস্পাঠীর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল বিশুদ্ধ প্রাচীন পদ্ধতি অনুসারে বিনা বেতনে উপযুক্ত অভিজাত শিক্ষকবৃন্দের তত্ত্বাবধানে সকল আগ্রহীশীল ছাত্রকে হিন্দু ধর্মীয় দর্শন ও শাস্ত্র অধ্যয়নে সহায়তা করা। এর মূল লক্ষ্য ছিল হিন্দু শৃংখলা অনুযায়ী প্রাচীন গুরুগৃহবাসের আর্দশ অনুসরণ করে শিক্ষার্থীর দৈনন্দিন জীবন ও আচরণ নিয়ন্ত্রণ করা। উপরোক্ত উদ্দেশ্যের সঙ্গে একটি আধুনিক জীবনোপযোগী উদ্দেশ্য সংযুক্ত করেছিলেন সতীশ চন্দ্র ব্যবহারিক ও কারিগরী শিক্ষাদান।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.২

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ তথা সিপাহী বিদ্রোহ কত সালে সংগঠিত হয়েছিল?
ক. ১৮৩৭
খ. ১৮৪৭
গ. ১৮৫৭
ঘ. ১৮৬৭

২. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভারতীয় উপাচার্য কে ছিলেন?
ক. গুরুদাস বন্দোপাধ্যায়
খ. প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার
গ. আশুতোষ মুখার্জী
ঘ. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৩. ভাগবত চতুস্পাঠী কলিকাতায় কোন এলাকায় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল?
ক. পার্ক স্ট্রীট
খ. ভবানীপুর
গ. যাদবপুর
ঘ. শ্যামবাজার

উত্তরমালা: ১. গ; ২. ক; ৩. খ

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. যুব শিক্ষা পরিষদ-এর একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।
২. যুবগণের উচ্চ শিক্ষা পরিষদ গঠনের কারণ কী ছিল?
৩. ভাগবত চতুস্পাটী প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যসমূহ বর্ণনা করুন।

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. ঊনিশ শতকে ভারতে জাতীয় শিক্ষার উদ্ভবের পটভূমি উল্লেখপূর্বক এর বিস্তারিত বিবরণ দিন।

পাঠ ৪.৩: বিশ শতকে জাতীয় শিক্ষার বিকাশ
Development of the National Education in Twentieth Century

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বিশ শতকে জাতীয় শিক্ষার বিকাশ বর্ণনা করতে পারবেন।
- ভারতীয় শিক্ষা আন্দোলনে গোখলের শিক্ষা বিলের ভূমিকা নিরূপণ করতে পারবেন।
- খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন কালে জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বিশ শতক

বিশ শতকের শুরু থেকে ভারতে রাজনীতি,সমাজনীতি, শিক্ষা সর্বক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদ শক্তিশালী রূপ নেয়। জাতীয়তাবাদী প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশপ্রেমিক নেতৃবৃন্দ সরকারী সাহায্য ব্যতিরেকে দেশের বিভিন্ন স্থানে গড়ে তোলেন স্বাধীন জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

শান্তি নিকেতন প্রতিষ্ঠা ও রবীন্দ্রনাথের শিক্ষানীতি

শান্তি নিকেতন (১৯০১)

বিংশ শতাব্দীর প্রথমমার্ধে সাহিত্য ও শিক্ষার ক্ষেত্রে জাতীয়তাবোধের জাগরণে রবীন্দ্রনাথের সক্রিয় ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। তিনি চেয়েছিলেন এমন একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেখানে শিক্ষার্থীরা স্বাভাবিক ও স্বাধীনভাবে নিজ নিজ জীবন বিকাশের সুযোগ পাবে। ১৮৮৩-১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা চিন্তায় যে কথাটি মূখ্য ছিল তা হচ্ছে বাঙ্গালির শিক্ষা সার্থক হতে হলে তাকে সর্ববিদ্যা মাতৃভাষা বাংলার মাধ্যমে অর্জন করতে হবে, তাকে বাংলা ভাষার চর্চা করতে হবে। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর নব শিক্ষানীতিকে বাস্তবে রূপদানের উদ্দেশ্যে শান্তি নিকেতনে ব্রহ্মচর্য আশ্রম ও বিদ্যালয় স্থাপন করেন। পরবর্তীতে সেই ক্ষুদ্র আশ্রমটি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে।

শিক্ষা সংকোচন নীতির বিরূদ্ধে আন্দোলন

ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন (১৯০২)

এ সময়ে সাহিত্য ও শিক্ষার মাধ্যমে যখন ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চলছে তখন ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন ও লর্ড কার্জনের শিক্ষা সংস্কার তথা উচ্চ শিক্ষা সংকোচন নীতি এই আন্দোলনের অগ্রগতিকে তীব্র করে তোলে। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের অন্যতম সদস্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য গুরুদাস বন্দোপাধ্যায় শিক্ষাকে সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন করার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান। কমিশনের রির্পোটের সঙ্গে তিনি একমত হতে পারেননি। তিনি তার মত পৃথকভাবে ‘নোট অব ডিসেন্ট’এ ব্যক্ত করেছিলেন। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের তৎকালীন সভাপতি সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী বলেন উচ্চ শিক্ষা সংকোচ সাধনই লর্ড কার্জনের শিক্ষানীতির মূল উদ্দেশ্য। কমিশন বেসরকারী আইন কলেজ ও দ্বিতীয় শ্রেণির

কলেজগুলি তুলে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কমিশনের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ভারতব্যাপী আন্দোলন শুরু হলে সরকার বেসরকারী আইন কলেজ ও দ্বিতীয় শ্রেণির কলেজগুলি তুলে দেয়ার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়।

ডন সোসাইটি (১৯০২)

বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের (১৯০২) রির্পোটি প্রকাশ পেলে ভারতের সর্বত্র এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় উঠে। বিভিন্ন পত্র পত্রিকা ও বক্তৃতায় এর বিরুদ্ধে মত প্রকাশিত হতে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের রির্পোটের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হিসাবে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে জুলাই মাসে ডন সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি নিজে সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক হন এবং সভাপতি হন তদানীন্তন মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউটের অধ্যক্ষ নগেন্দ্রনাথ ঘোষ। ডন সোসাইটির মূখ্য উদ্দেশ্য ছিল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি বিচ্যুতি দুর করত তৎকালীন পুঁথি সর্বস্ব ডিগ্রীলাভ প্রণোদিত শিক্ষা ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে এমন শিক্ষা ব্যবস্থা করা যাতে ছাত্রদের স্বাধীন চিন্তা ও কল্পনার উন্মেষ ঘটে, যাতে অর্জিত বিদ্যা জীবনের অঙ্গে পরিণত হয়। একই সঙ্গে মনে স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি প্রীতির উন্মেষ এবং স্বদেশ ও স্বজাতির জন্য আত্নত্যাগের আকাংখা সঞ্চার করা।

বিশ্ববিদ্যালয় আইনের বিরূদ্ধে প্রতিবাদের কারণ

ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন (১৯০৪)

সমস্ত প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে লর্ড কার্জন ১৯০৪ খ্রী: ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাশ করেন। এই আইনের বিরুদ্ধে প্রচন্ড বিক্ষোভ দেখা দেয়। এমন কি ভারতীয়দের সঙ্গে কয়েকজন ইউরোপীয় চিন্তাবিদও প্রতিবাদ করেন। এই আইনের বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগ ছিল–

- এই আইন দ্বারা সমস্ত শিক্ষা ব্যবস্থাই সরকারী নিয়ন্ত্রণের অধীনস্থ হয় এবং শিক্ষা বিস্তারের পথে বাধা সৃষ্টি করা হয়।
- সাহিত্য, বিজ্ঞান বা কারিগরী কোন ক্ষেত্রেই ছাত্রদের জ্ঞান অর্জনের কোন ব্যবস্থাই আইনে নেই। উপরন্তু প্রবেশিকা পরীক্ষায় ইংরেজিতে পাশের নম্বর বাড়িয়ে দিয়ে পরীক্ষায় ছাত্রের সাফল্যের পথকে রুদ্ধ করা হয়।
- এই আইনের ফলে অর্ধ শিক্ষিত তরুণের সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে চলবে এবং তারা সমাজের পক্ষে হয় অপ্রয়োজনীয়, নয় বিপদজনক হয়ে উঠবে।
- বিপুল সংখ্যক ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় ব্যর্থ হলে ছাত্রের অভাবে বেসরকারী কলেজগুলি বন্ধ হয়ে যাবে।

বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫) ও জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন

লর্ড র্কাজনের বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্তের ফলে ভারতীয় রাজনীতি ও শিক্ষা উভয় ক্ষেত্রে জাতীয় আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠে। সারা দেশে প্রতিবাদের ঝড় উঠে এবং স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনের মাধ্যমে এই প্রতিবাদ আত্নপ্রকাশ করে। এই বয়কট আন্দোলনের অঙ্গরূপে সরকার নিয়ন্ত্রিত বিশ্ববিদ্যালয় বয়কট করার আন্দোলন দেখা দেয়। এমএ ও পিআরএস এর পরীক্ষার্থী, কয়েকজন বিশেষ মেধাবী ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা বয়কট করে। এ ঘটনা ছাত্র সমাজে অভূতপূর্ব জাগরণ সৃষ্টি করে। ছাত্ররা এই প্রতিবাদ আন্দোলনে অগ্রণী হয়ে দেখা দেয়।

লর্ড কার্জনের পরিশাসন নীতি ভারতীয়দের মধ্যে এই জাতীয় চেতনাকে তীব্র করে তোলে এবং এ থেকেই তাদের মধ্যে জাতীয়তাবোধের জন্ম হয়।

বিভিন্ন জাতীয় সংস্থার জন্ম

বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে সঞ্জীবনী ও বঙ্গদর্শন প্রভৃতি পত্রিকা বিদেশী পণ্য বর্জন ও স্বদেশী বস্তু ব্যবহারের আহবান জানায়। এ সময়ে রবীন্দ্রনাথ, রজনীকান্ত ও অন্যান্য কবির লিখিত দেশাত্নবোধক গান ও কবিতা বাঙালিদের মধ্যে

নতুন উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। ব্যারিষ্টার আবদুল রসুল, জনপ্রিয় নেতা লিয়াকত হোসেন এবং মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীসহ অনেক প্রখ্যাত মুসলিম এই আন্দোলনে যোগ দেন। এ সঙ্গে মনোরঞ্জন ঠাকুর তার ব্রতী সমিতি, সুরেশচন্দ্র সমাজপতির বন্দেমাতরম গোষ্ঠী দক্ষিণ কলিকাতায় যুব সমাজের সন্তান সম্প্রদায় প্রভৃতি নতুন নতুন জাতীয় সংস্থা গড়ে উঠে।

বঙ্গবিরোধী আন্দোলনে ছাত্র সমাজ দলে দলে যোগদান করে।ছাত্রদের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী তথা স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনে যোগ দেয়া নিষিদ্ধ করে সরকার নির্দেশ জারী (কার্লাইল সার্কুলার নামে খ্যাত) করলে ছাত্র সমাজ এই অন্যায় ও অপমানজনক নির্দেশের প্রতিবাদ স্বরূপ গড়ে তোলে বিজ্ঞপ্তি বিরোধী সমিতি।

জাতীয় শিক্ষা পরিষদ (১৯০৬)

এই আন্দোলন ক্রমে ক্রমে বিস্তার লাভ করলে ১৯০৫ সনের নভেম্বরে কলিকাতায় একটি জাতীয় শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় জাতীয় আদর্শ নীতি অনুযায়ী জাতীয় নিয়ন্ত্রণে শিক্ষা দেয়ার জন্য একটি জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গঠনের প্রস্তাব করা হয়।

জাতীয় শিক্ষা সম্মেলন ও জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গঠন

জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনে সতীশচন্দ্র পরিচালিত ডন সমিতি ও ডন পত্রিকা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। বস্তুত ডন সমিতি ও ডন পত্রিকাই জাতীয় শিক্ষার প্রসারে অনুপ্রেরণা যোগায়। শিক্ষা সম্মেলনের প্রস্তাব অনুযায়ী ১৯০৬ খ্রী: জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গঠিত হয়। এই পরিষদের উদ্দেশ্য হল প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং জাতীয় আদর্শ অনুযায়ী ও জাতীয় নিয়ন্ত্রণাধীনে সাহিত্য, বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা করা। শিক্ষার মাধ্যম হবে মাতৃভাষা। তবে ইংরেজি অবশ্য পাঠ্য থাকবে।

বঙ্গীয় জাতীয় কলেজ ও বিদ্যালয়

জাতীয় শিক্ষা পরিষদের উদ্যোগে বঙ্গীয় জাতীয় কলেজ ও বিদ্যালয় নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। এই কলেজটির তিনটি বিভাগ ছিল- কলা বিভাগ, বিজ্ঞান বিভাগ ও কারিগরি বিভাগ। উৎপাদনভিত্তিক শিক্ষাদান ও গবেষণা পরিচালনার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা

জাতীয় শিক্ষার আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে দেশের সর্বত্র নানা ধরনের জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম জাতীয় বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয় রংপুরে। এরপর ঢাকা, দিনাজপুর, চাঁদপুর, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, কিশোরগঞ্জ, মাগুরা, প্রভৃতি স্থানে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের আদর্শে জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ছিল নিম্নরূপ–

- ভারতীয়দের শিক্ষা ব্যবস্থা ভারতীয়দের হাতেই থাকবে। শিক্ষার ক্ষেত্রে বিদেশী নিয়ন্ত্রণের অবসান ঘটাতে হবে।
- শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীরা জন্মভূমিকে ভালবাসতে শিখবে। ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষায় ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির কোনও স্থান নেই বরং শিক্ষার্থীদের সেগুলিকে তাচ্ছিল্য করতে শেখান হয়। জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীরা নিজের দেশের ঐতিহ্যকে শ্রদ্ধা করতে শিখবে।

- জাতীয় শিক্ষা বিদেশীদের অনুকরণ করতে শেখাবে না। 'রক্তে ও গায়ের রঙে ভারতীয় কিন্তু অন্যান্য সব দিক দিয়ে ইংরেজ, মেকলের বর্ণিত এই ধরণের মানুষ তৈরী করা শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে না। মনে প্রাণে, আদর্শে ও উপলব্ধিতে সত্যিকারের ভারতীয় সৃষ্টি করাই জাতীয় শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য হবে।
- ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় ইংরেজি ভাষার একাধিপত্য থাকবে না। ইংরেজি ভাষা শিক্ষার মাধ্যম রূপে ব্যবহৃত হবে না, যদিও ইংরেজি ভাষা শিক্ষা আবশ্যিক হবে।

ভারতীয় শিক্ষা আন্দোলন ও গোখেলের শিক্ষা বিল

জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের ফলে ভারতীয় রাজনৈতিক নেতৃবর্গ শিক্ষা বিস্তারে সরকারকে চাপ দিতে শুরু করেন। ১৯১০ সালে জি. কে গোখেল রাজকীয় আইন পরিষদে একটি বেসরকারী বিল উত্থাপন করেন। বিলে তিনি প্রস্তাব করেন যে, সমগ্র দেশব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করার প্রস্ততি পর্বরূপে এবং কি করে শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা যায় তার উপায় নির্ধারণের জন্য যত শীঘ্র সম্ভব সরকারী ও বেসরকারী সদস্য নিয়ে একটি মিশ্র কমিটি গঠন করা হউক। প্রস্তাবটি উত্থাপনের সময় তিনি বলেন ইংলন্ডের ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের শিক্ষা আইনের অনুরূপ একটি আইনে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানসমূহের নিজ নিজ এলাকায় প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যাতামুলক করার দায়িত্ব দেয়া হউক। প্রথম অবস্থায় ছেলেদের শিক্ষাই বাধ্যতামূলক করা হবে। শুরুতেই ৬ থেকে ১০ বছরের ছেলেদের এই আইনের আওতায় আনা হবে। যেসব জায়গায় স্কুলে যাওয়ার যোগ্য ছেলেদের মধ্যে শতকরা ৩৩ জন স্কুলে যাচ্ছে সেখানেই শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক হবে।

কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ কর্তৃক প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার দাবী

প্রস্তাবটি আলোচনা কালে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আশ্বাস দেন যে সরকার থেকে প্রাথমিক শিক্ষার বিষয়টি বিশেষ সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করা হবে। সরকারী আশ্বাসের ফলে গোখেল প্রস্তাবটি প্রত্যাহার করেন। কার্যত পরে দেখা গেল সরকার থেকে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার কোন প্রচেষ্টা নেয়া হয়নি।

এই বিল উত্থাপনের ফলে সারা দেশে প্রাথমিক শিক্ষার সমস্যা বিষয়ে ব্যাপক আলোচনা চলতে থাকে। ১৯১০ খ্রী: জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ তাদের সম্মেলনে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক করার দাবি জানিয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করে। সহকারী ভারত সচিব ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ঘোষণা করেন যে, গণশিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যেই কেন্দ্রীয় শিক্ষা বিভাগ সৃষ্টি করা হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষা প্রসঙ্গে গোখেলের দ্বিতীয় বিল

কেন্দ্রীয় সরকার এক বছরের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের জন্য কোন কার্যকরী পদক্ষেপ না নেয়ায় গোখেল ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে রাজকীয় আইন পরিষদে নতুন করে প্রাথমিক শিক্ষা বিল উত্থাপন করেন। বিলটি যাতে সরকারী ও বেসরকারী সমর্থন লাভ করে, সেজন্য বিশেষ চিন্তা করে ধারাগুলি রচনা করেন। বিলটিতে বলা হয় যে কোন অঞ্চলে নির্দিষ্ট সংখ্যক ছেলে-মেয়ে অধ্যয়নরত থাকলে এই আইনটি প্রয়োগ করা হবে। এই সংখ্যা কত হতে হবে তা পরিষদ স্থির করবে।

বিল সম্পর্কে প্রাদেশিক সরকার, বিশ্ববিদ্যালয় ও জনকল্যাণ প্রতিষ্ঠানসমূহের মতামত গ্রহণ করা হয়। গোখেল বিলের ধারাগুলি নিয়ে বিবেচনা করার জন্য ১৫ জন সদস্য নিয়ে গঠিত সিলেক্ট কমিটিতে বিলটি পাঠাবার প্রস্তাব করলে সরকার এর বিরোধিতা করেন। সরকার যুক্তি দেখায় যে, দেশের জনসাধারণ এখনও বাধ্যতামূলক শিক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়নি। এ বিলের বিরোধিতা করায় সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। এই বিক্ষোভ প্রশমিত করার জন্য সরকার প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয় নির্বাহ করার জন্য প্রতিবৎসর অতিরিক্ত ৫০ লক্ষ টাকা সাহায্য মঞ্জুর করে।

খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলন ও জাতীয় শিক্ষা

জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয় খিলাফত অসহযোগ আন্দোলন (১৯১৯ -১৯২২) কে কেন্দ্র করে। এ সময়ে মহাত্মা গান্ধী, প্রখ্যাত খিলাফত নেতা মৌলানা শওকত আলী, মৌলানা মহম্মদ আলী সরকারী শিক্ষায়তন বয়কটের আহবান জানান। এ আহবানে সারা দিয়ে সরকারী শিক্ষায়তন থেকে ছাত্ররা বের হয়ে পড়ে। ভারতের সর্বত্র জাতীয় বিদ্যালয়, জাতীয় কলেজ, ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি স্থাপিত হতে শুরু হয়। ১৯২০ - ১৯২১ সালের একটি পরিসংখ্যানে দেখা যায়, সে সময় সারা দেশে মোট জাতীয় বিদ্যালয় ও কলেজের সংখ্যা ছিল ১৩৯৯টি এবং সেগুলির শিক্ষার্থী সংখ্যা ছিল ৯৬,৬৮২ জন; এর মধ্যে বাংলাদেশে জাতীয় বিদ্যালয় ও কলেজের সংখ্যা ছিল ১৯০টি এবং শিক্ষাথীর সংখ্যা ছিল প্রায় ১৫ হাজার। ১৯২২ সালে জাতীয় শিক্ষার আন্দোলন মন্থর হয়ে যাবার ফলে বহু জাতীয় শিক্ষার বিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যায়। অনেকেই জনশিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে জাতীয় শিক্ষার বিদ্যালয়ের ভুমিকা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন। তাদের মতে দেশের জনগণের শিক্ষার দায়িত্ব নেবে সরকার এবং জনগণের মধ্যে সত্যিকারের ব্যাপক শিক্ষার বিস্তার একমাত্র সরকারী প্রচেষ্টার দ্বারাই সম্ভব হতে পারে। ফলে জনশিক্ষার বিস্তারের জন্য বিচ্ছিন্ন বেসরকারী প্রচেষ্ঠার উপর গুরুত্ব না দিয়ে সরকারের উপর চাপ দেয়ার পক্ষেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। পরবর্তীকালে শিক্ষার আন্দোলন এই পথেই প্রবাহিত হয়।

জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া প্রতিষ্ঠা

খিলাফত অসহযোগ আন্দোলন কালে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে ১৯২০-২১ সালে আলিগড়ে প্রতিষ্ঠিত হয় জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া নামক বিশ্ববিদ্যালয়টি। ১৯২৫ খ্রীঃ আলিগড় থেকে এটি দিল্লীতে স্থানান্তরিত হয়। এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন হাকিম আজমল খান এবং ডক্টর এম এ আনসারী। বিশ্ববিদ্যালয়টির উদ্দেশ্য ছিল–

- জাতীয় সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার অনুযায়ী শিক্ষা দেয়া এবং সেই সঙ্গে অপরের সংস্কৃতির যথাযথ মূল্য দেয়া। তার সঙ্গে শিক্ষার্থীর সেবা, সহনশীলতা, আত্মসংযম এবং আত্ম সম্মানের শিক্ষা দেয়া।
- শিক্ষার্থীর বিকাশমান মনের জ্ঞানমূলক ও প্রক্ষোভমূলক চাহিদার তৃপ্তির আয়োজন, সক্রিয় আত্ম-অভিব্যক্তির পর্যাপ্ত সুযোগদান এবং ভীতি প্রদর্শনের পরিবর্তে শিক্ষার্থীদের মধ্যে দায়িত্বজ্ঞান ও আগ্রহ সৃষ্টি দ্বারা শৃংখলা রক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের চরিত্র গঠন করা।

জামিয়া মিলিয়ার অধীনে বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান ছিল। যথা- একটি আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়, একটি আবাসিক মাধ্যমিক বিদ্যালয়,একটি আবাসিক প্রাথমিক বিদ্যালয়, জাতীয় শিক্ষা কেন্দ্র, জামিয়া রাসায়নিক শিল্প কেন্দ্র,উদু একাডেমি এবং পাঠাগার ও মক্তব নামে একটি পুস্তক প্রতিষ্ঠান। জামিয়া নামে একটি উর্দু মাসিক পত্রিকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত হত। বর্তমানে এটি একটি আন্তর্জাতিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে খ্যাতি লাভ করেছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৩

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী লর্ড কার্জনের শিক্ষা সংস্কার নীতিকে কী বলে আখ্যায়িত করেছিলেন?
ক. শিক্ষা সংকোচন নীতি
খ. শিক্ষার বিস্তারনীতি
গ. শিক্ষা সম্প্রসারণ নীতি
ঘ. শিক্ষা বেসরকারিকরণ নীতি

২. কোন মুসলিম জাতীয়তাবাদী নেতা জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন?
ক. নবাব সলিমউল্লাহ
খ. মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী
গ. আব্দুল লতিফ
ঘ. আব্দুর রহমান

৩. প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করার জন্য জি. কে. গোখেল ভারতীয় রাজকীয় পরিষদে কত সালে প্রথম বিল উত্থাপন করেছিলেন?
ক. ১৯০৫ খ. ১৯০৭
গ. ১৯১০ ঘ. ১৯১১

উত্তরমালা: ১. ক; ২. খ; ৩. গ;

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. লর্ড কার্জনের শিক্ষা সংকোচন নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলনে গুরুদাস বন্দোপাধ্যায়ের ভূমিকা কী ছিল?
২. ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইনের (১৯০৪) বিরুদ্ধে ভারতীয়দের অভিযোগগুলো ব্যক্ত করুন।
৩. ডন সোসাইটি কে এবং কী উদ্দেশ্যে গঠন করেছিলেন?
৪. জাতীয় শিক্ষা পরিষদের প্রতিষ্ঠা ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করুন।
৫. জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা করুন।
৬. গোখলের প্রথম শিক্ষা বিলে কী প্রস্তাব করা হয়েছিল?
৭. গোখলের দ্বিতীয় শিক্ষা বিলের প্রস্তাব কী ছিল?
৮. খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলন কালে জাতীয় শিক্ষা বিস্তারে মৌলানা মুহম্মদ আলী ও শওকত আলীর ভূমিকা কী ছিল?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. উপনিবেশিক ভারতে জাতীয় শিক্ষা বিস্তারে বিভিন্ন সংগঠনের ভূমিকা মূল্যায়ন করুন।
২. জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়ার বিশেষ ভূমিকা উল্লেখপূর্বক খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলন কালে জাতীয় শিক্ষার বিস্তার সম্পর্কে একটি বিবরণ দিন।
৩. ভারতের শিক্ষা আন্দোলনে গোখেলের ভূমিকা বিশ্লেষণ করুন।